প্রিয়নাথ সিংহ - ১

[প্রিয়নাথ সিংহ স্বামীজীর বাল্যবন্ধু ও পাড়ার ছেলে; নরেন্দ্রনাথকে ভালবাসিতেন, শ্রদ্ধাও করিতেন। তিনি কোথায় আছেন, কি করিতেছেন -- সব সংবাদ রাখিতেন। আমেরিকায় তাঁহার প্রচার-সাফল্যে আনন্দিত হইয়াছেন, মাদ্রাজে তাঁহার সংবর্ধনায় উৎসাহিত হইয়াছেন, কলিকাতায় নিজেরাই তাঁহাকে অভিনন্দিত করিয়াছেন। এখন নির্জনে বাল্যবন্ধুকে কাছে পাইবার আশায় কাশীপুরে গোপাল লাল শীলের বাগানে আসিয়াছেন।]

অবসর পেয়েই তাঁকে ধরে নিয়ে বাগানে গঙ্গার ধারে বেড়াতে এলুম। তিনিও শৈশবের খেলুড়েকে পেয়ে আগেকার মতোই কথাবার্তা আরম্ভ করলেন। দু-চারটা কথা বলতে না বলতেই ডাকের ওপর ডাক এল যে, অনেক নূতন লোক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। এবার একটু বিরক্ত হয়ে বললেন, 'বাবা, একটু রেহাই দাও; এই ছেলেবেলাকার খেলুড়ের সঙ্গে দুটো কথা কি, একটু ফাঁকা হাওয়ায় থাকি। যাঁরা এসেছেন, তাঁদের যত্ন করে বসাওগে, তামাক-টামাক খাওয়াওগে।'

যে ডাকতে এসেছিল, সে চলে গেলে জিজ্ঞাসা করলুম, স্বামীজী, তুমি সাধু। তোমার অভ্যর্থনার জন্যে যে টাকা আমরা চাঁদা করে তুললুম, আমি ভেবেছিলুম, তুমি দেশের দুর্ভিক্ষের কথা শুনে কলকাতায় পৌঁছবার আগেই আমাদের 'তার' করবে -- আমার অভ্যর্থনায় এক পয়সা খরচ না করে দুর্ভিক্ষ-নিবারণী ফান্ডে ঐ সমস্ত টাকা চাঁদা দাও। কিন্তু দেখলুম তুমি তা করলে না; এর কারণ কি?

স্বামীজী বললেন, হাঁ, আমি ইচ্ছেই করেছিলুম যে, আমায় নিয়ে একটা খুব হইচই হয়। কি জানিস? একটা হইচই না হলে তাঁর (ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের) নামে লোক চেতবে কি করে? এত ovation (সংবর্ধনা) কি আমার জন্যে করা হল, না তাঁর নামেরই জয়জয়কার হল? তাঁর বিষয় জানবার জন্যে লোকের মনে কতটা ইচ্ছে হল। এইবার ক্রমে তাঁকে জানবে, তবে না দেশের মঙ্গল হবে! যিনি দেশের মঙ্গলের জন্যে এসেছেন, তাঁকে না জানলে লোকের মঙ্গল কি করে হবে? তাঁকে ঠিক ঠিক জানলে তবে মানুষ তৈরি হবে, আর মানুষ তৈরি হলে দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি তাড়ানো কতক্ষণের কথা! আমাকে নিয়ে এই রকম বিরাট সভা করে হইচই করে তাঁকে প্রথমে মানুক -- আমার এই ইচ্ছেই হয়েছিল; নতুবা আমার নিজের জন্যে এত হাঙ্গামের কি দরকার ছিল? তোদের বাড়ি গিয়ে যে একসঙ্গে খেলতুম, তার চেয়ে আর আমি কি বড়লোক হয়েছি? আমি এখনও যা ছিলুম, এখনও তাই আছি। তুই-ই বল না, আমার কোন পরিবর্তন দেখছিস?'

আমি মুখে বললুম, 'না, সে রকম তো কিছুই দেখছিনি।' তবে মনে হল -- সাক্ষাৎ দেবতা হয়েছ।

স্বামীজী বলতে লাগলেন, 'দুর্ভিক্ষ তো আছেই, এখন যেন ওটা দেশের ভূষণ হয়ে পড়েছে। অন্য কোন দেশে দুর্ভিক্ষের এত উৎপাত আছে কি? নেই; কারণ সে-সব দেশে 'মানুষ' আছে। আমাদের দেশের মানুষগুলো একেবারে জড় হয়ে গেছে। তাঁকে দেখে, তাঁকে জেনে লোকে স্বার্থত্যাগ করতে শিখুক, তখন দুর্ভিক্ষ-নিবারণের ঠিক ঠিক চেষ্টা আসবে। ক্রমে সে চেষ্টাও করব, দেখ না।'

আমি -- আচ্ছা, তুমি এখানে খুব লেকচার-টেকচার দেবে তো? তা না হলে তাঁর নাম কেমন করে প্রচার হবে?

স্বামীজী -- তুই খেপেছিস, তাঁর নাম-প্রচারের কি কিছু বাকি আছে? লেকচার করে এদেশে কিছু হবে না। বাবুভায়ারা শুনবে, 'বেশ বেশ' করবে, হাততালি দেবে; তারপর বাড়ি গিয়ে ভাতের সঙ্গে সব হজম করে ফেলবে।

পচা পুরানো লোহার উপর হাতুড়ির ঘা মারলে কি হবে? ভেঙে গুঁড়ো হয়ে যাবে; তাকে পুড়িয়ে লাল করতে হবে; তবে হাতুড়ির ঘা মেরে একটা গড়ন করতে পারা যাবে। এদেশে জলন্ত জীবন্ত উদাহরণ না দেখালে কিছুই হবে না। কতকগুলো ছেলে চাই, যারা সব ছেড়েছুড়ে দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করবে। তাদের life আগে তয়ের করে দিতে হবে, তবে কাজ হবে।

আমি -- আচ্ছা, স্বামীজী, তোমার নিজের দেশের লোক নিজের ধর্ম বুঝতে না পেরে কেউ কৃশ্চান, কেউ মুসলমান, কেউ বা অন্য কিছু হচ্ছে। তাদের জন্যে তুমি কিছু না করে গেলে কিনা আমেরিকা ইংলণ্ডে ধর্ম বিলুতে?

স্বামীজী -- কি জানিস, তোদের দেশের লোকের যথার্থ ধর্ম গ্রহণ করবার শক্তি কি আছে? আছে কেবল একটা অহঙ্কার যে, আমরা ভারী সত্ত্বগুণী। তোরা এককালে সাত্ত্বিক ছিলি বটে, কিন্তু এখন তোদের ভারী পতন হয়েছে। সত্ত্ব থেকে পতন হলে একেবারে তময় আসে। তোরা তাই আসেছিস। মনে করেছিস বুঝি, যে নড়ে না চড়ে না, ঘরের ভেতর বসে হরিনাম করে, সামনে অপরের উপর হাজার অত্যাচার দেখেও চুপ করে থাকে, সেই-ই সত্ত্বগুণী -- তা নয়, তাকে মহা তময় ঘিরেছে। যে-দেশের লোক পেটটা ভরে খেতে পায় না, তার ধর্ম হবে কি করে? জে-দেশের লোকের মনে ভোগের কোন আশাই মেটেনি, তাদের নিবৃত্তি কেমন করে হবে? তাই আগে যাতে মানুষ পেটটা ভরে খেতে পায় এবং কিছু ভোগবিলাস করতে পারে, তারই উপায় কর, তবে ক্রমে ঠিক ঠিক বৈরাগ্য এলে ধর্মলাভ হতে পারে। বিলেত-আমেরিকার লোকেরা কেমন জানিস? পূর্ণ রজোগুণী, বিশ্বব্রহ্মান্ডের সকল রকম ভোগ করে এলে গেছে। তাতে আবার কৃশ্চানী ধর্ম -- মেয়েলী ভক্তির ধর্ম, পুরাণের ধর্ম! শিক্ষার বিস্তার হওয়াতে তাতে আর তাদের শান্তি হচ্ছে না। তারা যে অবস্থায় আছে, তাতে তাদের একটা ধাক্কা দিয়ে দিলেই সত্ত্বগুণে পৌঁছয়। তারপর আজ একটা লালমুখ এসে যে কথা বলবে, তা তোরা যত মানবি, একটা ছেঁড়ান্যাকড়া-পরা সন্ন্যাসীর কথা তত মানবি কি?

আমি -- এন. ঘোষও ঠিক ঐ ভাবের কথা বলেছিলেন।

স্বামীজী -- হাঁ, আমার সেখানকার চেলারা সব যখন তৈরি হয়ে এখানে এসে তোদের বলবে, 'তোমরা কি করছ, তোমাদের ধর্ম-কর্ম রীতি-নীতি কিসে ছোট? দেখ, তোমাদের ধর্মটাই আমরা বড় মনে করি' -- তখন দেখিস হুদো হুদো লোক সে কথা শুনবে। তাদের দ্বারা এদেশের বিশেষ উপকার হবে। মনে করিসনি, তারা ধর্মের গুরুগিরি করতে এদেশে আসবে। বিজ্ঞান প্রভৃতি ব্যবহারিক শাস্ত্রে তারা তোদের গুরু হবে, আর ধর্মবিষয়ে এদেশের লোক তাদের গুরু হবে। ভারতের সঙ্গে সমস্ত জগতের ধর্মবিষয়ে এই সম্বন্ধ চিরকাল থাকবে।

আমি -- তা কেমন করে হবে? ওরা আমাদের যে-রকম ঘৃণা করে, তাতে ওরা যে কখন নিঃস্বার্থভাবে আমাদের উপকার করবে, তা বোধ হয় না।

স্বামীজী -- ওরা তোদের ঘৃণা করবার অনেকগুলি কারণ পায়, তাই ঘৃণা করে। একে তো তোরা বিজিত, তার ওপর তোদের মতো 'হাঘরের দল' জগতে আর কোথাও নেই। নীচ জাতগুলো তোদের চিরকালের অত্যাচারে উঠতে-বসতে জুতো লাথি খেয়ে, একেবারে মনুষ্যত্ব হারিয়ে এখন professional (পেশাদার) ভিখিরি হয়েছে; তাদের উপরশ্রেণীর লোকেরা দু-এক পাতা ইংরেজী পড়ে আর্জি হাতে করে সকল অফিসের আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়াচ্ছে। একটা বিশ টাকার চাকরি খালি হলে পাঁচ-শ বি. এ., এম. এ. দরখাস্ত করে। পোড়া দরখাস্তও বা কেমন! -- 'ঘরে ভাত নেই, মাল-ছেলে খেতে পাচ্ছে না, সাহেব, দুটি খেতে দাও, নইলে গেলুম!' চাকরিতে ঢুকেও দাসত্বের চূড়ান্ত করতে হয়। তিদের উচ্চশিক্ষিত বড় বড় (?) লোকেরা দল বেঁধে 'হায় ভারত গেল! হে ইংরেজ,

তোমরা আমাদের লোকদের চাকরি দাও, দুর্ভিক্ষ মোচন কর' ইত্যাদি দিনরাত কেবল 'দাও, দাও' করে মহা হল্লা করছে। সকল কথার ধুয়ো হচ্ছে -- 'ইংরেজ, আমাদের দাও!' বাপু, আর কত দেবে? রেল দিয়েছে, তারের খবর দিয়েছে, রাজ্যে শৃঙ্খলা দিয়েছে, ডাকাতের দল প্রায় তাড়িয়েছে, বিজ্ঞানশিক্ষা দিয়েছে। আবার কি দেবে? নিঃস্বার্থ ভাবে কে কি দেয়? বলি বাপু, ওরা তো এত দিয়েছে, তোরা কি দিয়েছিস?

আমি -- আমাদের দেবার কি আছে? রাজ্যের কর দিই।

স্বামীজী -- আ মরি! সে কি তোরা দিস, জুতো মেরে আদায় করে -- রাজ্যরক্ষা করে বলে। তোদের যে এত দিয়েছে, তার জন্য কি দিস -- তাই বল্। তোদের দেবার এমন জিনিস আছে, যা ওদেরো নেই। তোরা বিলেত যাবি, তাও ভিখিরি হয়ে, কিনা বিদ্যে দাও। কেউ গিয়ে বড়জোর তাদের ধর্মের দুটো তারিফ করে এলি, বড় বাহাদুরি হল। কেন, তোদের দেবার কি কিছু নেই? অমূল্য রত্ন রয়েছে, দিতে পারিস -- ধর্ম দে, মনোবিজ্ঞান দে। সমস্ত জগতের ইতিহাস পড়ে দেখ, যত উচ্চ ভাব পূর্বে ভারতেই উঠেছে। চিরকাল ভারত জনসমাজে ভাবের খনি হয়ে এসেছে; ভাব প্রসব করে সমস্ত জগৎকে ভাব বিতরণ করেছে। আজ ইংরেজ ভারতে এসেছে সেই উচ্চ উচ্চ ভাব, সেই বেদান্তজ্ঞান, সেই সনাতন ধর্মের গভীর রহস্য নিতে। তোরা ওদের নিকট যা পাস, তার বিনিময়ে তোদের ঐ-সব অমূল্য রত্ন দান কর। তোদের এই ভিখিরি-নাম ঘুচাবার জন্যে ঠাকুর আমাকে ওদের দেশে নিয়ে গিয়েছিলেন। কেবল ভিক্ষে করবার জন্য বিলেত যাওয়া ঠিক নয়। কেন তোদের চিরকাল ভিক্ষে দেবে? কেউ কখনও দিয়ে থাকে? কেবল কাঙালের মতো হাত পেতে নেওয়া জগতের নিয়ম নয়। জগতের নিয়মই হচ্ছে আদান-প্রদান। এই নিয়ম যে-লোক বা যে-জাত বা যে-দেশ না রাখবে, তার কলতাণ হবে না। সেই নিয়ম আমাদেরও প্রতিপালন করা চাই। তাই আমেরিকায় গিয়েছিলুম। তাদের ভেতর এখন এতদূর ধর্মপিপাসা যে, আমার মতো হাজার হাজার লোক গেলেও তাদের স্থান হয়। তারা অনেক দিন থেকে তাদের ধনরত্ন দিয়েছে, তোরা এখন অমূল্য রত্ন দে। দেখবি ঘৃণাস্থলে শ্রদ্ধা-ভক্তি পাবি, আর তোদের দেশের জন্যে তারা অযাচিত উপকার করবে। তারা বীরের জাত, উপকার ভোলে না।

আমি -- ওদেশে লেকচারে আমাদের কত গুণপনা ব্যাখ্যা করে এসেছ, আমাদের ধর্মপ্রাণতার কত উদাহরণ দিয়েছ! আবার এখন বলছ, আমরা মহা তমোগুণী হয়ে গেছি। অথচ ঋষিদের সনাতন ধর্ম-বিলোবার অধিকারী আমাদেরই করছ -- এ কেমন কথা?

স্বামীজী -- তুই কি বলিস, তোদের দোষগুলো দেশে দেশে গাবিয়ে বেড়াব, না দোদের যা গুণ আছে, সেই গুণগুলোর কথাই বলে বেড়াব? যার দোষ তাকেই বুঝিয়ে বলা ভাল, আর তার গুণ দিয়ে ঢাক বাজানোই উচিত। ঠাকুর বলতেন যে, মন্দ লোককে 'ভাল ভাল' বললে সে ভাল হয়ে যায়; আর ভাল লোককে 'মন্দ মন্দ' বললে সে মন্দ হয়ে যায়। তাদের দোষের কথা তাদের কাছে খুব বলে এসেছি। এদেশ থেকে যত লোক এ পর্যন্ত ওদেশে গেছে, সকলে তাদের উণের কথাই গেয়ে এসেছে; আর আমাদের দোষের কথাই গাবিয়ে বেড়িয়েছে। কাজেই তারা আমাদের ঘৃণা করতে শিখেছে। তাই আমি তোদের গুণ ও তাদের দোষ তাদের দেখিয়েছি। তোরা যত তমোগুণী হোস না কেন, পুরাতন ঋশিদের ভাব তোদের ভেতর একটু-না-একটু আছে -- অন্ততঃ তার কাঠামোটা আছে। তবে হুট করে বিলেত গিয়েই যে ধর্ম-উপদেষ্টা হতে পারা যায়, তা নয়। আগে নিরালায় বসে ধর্ম-জীবনটা বেশ করে গড়ে নিতে হবে; পূর্ণভাবে ত্যাগী হতে হবে; আর অখন্ড ব্রহ্মচর্য করতে হবে; তোদের ভেতর তমোগুণ এসেছে -- তা কি হয়েছে? তমোনাশ কি হতে পারে না? এক কথায় হতে পারে। ঐ তমোনাশ করবার জন্যেই তো ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব এসেছেন।

আমি -- কিন্তু স্বামীজী, তোমার মতো কে হবে?

স্বামীজী -- তোরা ভাবিস, আমি মলে বুঝি আর 'বিবেকানন্দ' হবে না! ঐ যে নেশাখোরগুলো এসে কনসার্ট বাজিয়ে গেল, যাদের তোরা এত ঘৃণা করিস, মহা অপদার্থ মনে করিস, ঠাকুরের ইচ্ছে হলে ওরা প্রত্যেকে এক এক 'বিবেকানন্দ' হতে পারে, দরকার হলে 'বিবেকানন্দে'র অভাব হবে না। কোথা থেকে কত কোটি কোটি এসে হাজির হবে, তা কে জানে? এ বিবেকানন্দের কাজ নয় রে; তাঁর কাজ -- খোদ রাজার কাজ! একটা গভর্নর জেনারেল গেলে তাঁর জায়গায় আর একটা আসবেই। তোরা যতই তমোগুণী হোস না কেন, মন মুখ এক করে তাঁর শরণ নিলে সব তমঃ কেটে যাবে। এখন যে ও-রোগের রোজা এসেছে। তাঁর নাম করে কাজে লেগে গেলে তিনি আপনিই সব করে নেবেন। ঐ তমোগুণটাই সত্ত্বগুণ হয়ে দাঁড়াবে।

আমি -- যাই বল, ও-কথা বিশ্বাস হয় না। তোমার মতো Philosophyতে oratory (দর্শনে বক্তৃতা) করবার ক্ষমতা কার হবে?

স্বামীজী -- তুই জানিসনি। ও-ক্ষমতা সকলের হতে পারে। যে ভগবানের জন্য বারো বছর পর্যন্ত ব্রহ্মচর্য করবে, তারই ও-ক্ষমতা হবে। আমি ঐরূপ করেছি, তাই আমার মাথার ভেতর একটা পর্দা খুলে গিয়েছে। তাই আর আমাকে দর্শনের মতো জটিল বিষয়ের বক্তৃতা ভেবে বার করতে হয় না। মনে কর, কাল বক্তৃতা দিতে হবে, যা বক্তৃতা দেব তার সমস্ত ছবি আজ রাত্রে পর পর চোখের সামনে দিয়ে যেতে থাকে। পরদিন বক্তৃতার সময় সেই-সব বলি। অতএব বুঝলি তো, এটা আমার নিজস্ব শক্তি নয়। যে অভ্যাস করদে, তারই হবে। তুই কর, তোরও হবে। অমুকের হবে, আর অমুকের হবে না -- আমাদের শাস্ত্রে এ-কথা বলে না।

আমি -- তোমার মনে আছে, তখন তুমি সন্ন্যাস লও নাই, একদিন আমরা একজনের বাড়িতে বসেছিলুম; তুমি সমাধি ব্যাপারটা আমাদের বোঝাবার চেষ্টা করছিলে। কলিকালে ও-সব হয় না বলে আমি তোমার কথা উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করায় তুমি জোর করে বলেছিলে, 'তুই সমাধি দেখতে চাস, না সমাধিস্থ হতে চাস? আমার সমাধি হয়। আমি তোর সমাধি করে দিতে পারি।' তোমার এই কথা বলবার পরেই একজন নূতন লোক এসে পড়ল, আর আমাদের ঐ-বিষয়ের কোন কথাই চলল না।

স্বামীজী -- হাঁ, মনে পড়ে।

আমায় সমাদীস্থ করে দেবার জন্যে তাঁকে বিশেষরূপে ধরায় স্বামীজী বললেন, 'দেখ, গত কয়েক বৎসর ক্রমাগত বক্তৃতা দিয়ে আর কাজ করে আমার ভেতর রজোগুণ বড় বেড়ে উঠেছে; তাই সে শক্তি এখন চাপা পড়েছে। কিছুদিন সব কাজ ছেড়ে হিমালয়ে গিয়ে বসলে তবে আবার সে শক্তির উদয় হবে।'

এর দু-এক দিন পরে স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করব বলে আমি বাড়ি থেকে বেরুচ্ছি, এমন সময় দুটি বন্ধু এসে জানালেন যে, তাঁরাও স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করে প্রাণায়ামের বিষয় কিছু জিজ্ঞাসা করতে চান। তাঁদের সঙ্গে নিয়ে কাশিপুরের বাগানে এসে উপস্থিত হয়ে দেখলুম, স্বামীজী হাত মুখ ধুয়ে বাইরে আসছেন। শুধু হাতে দেবতা বা সাধু দর্শন করতে যেতে নেই শুনেছিলুম, তাই আমরা কিছু ফল ও মিষ্টান্ন সঙ্গে এনেছিলুম। তিনি আসবামাত্র তাঁকে সেইগুলি দিলুম; স্বামীজী সেগুলি নিয়ে নিজের মাথায় ঠেকালেন এবং আমরা প্রণাম করবার সগেই আমাদের প্রণাম করলেন। আমার সঙ্গের দুটি বন্ধুর মধ্যে একটি তাঁর সহপাঠী ছিলেন। তাঁকে চিনতে পেরে বিশেষ আনন্দের সহিত তাঁর সমস্ত কুশল জিজ্ঞাসা করলেন, পরে তাঁর নিকটে আমাদের বসালেন। আমরা যেখানে বসলুম, সেখানে আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন। সকলেই স্বামীজীর মধুর কথা শুনতে এসেছেন। অন্যান্য লোকের দু-একটি প্রশ্নের উত্তর

দিয়ে কথাপ্রসঙ্গে স্বামীজী নিজেই প্রাণায়ামের কথা কইতে লাগলেন। মনোবিজ্ঞান হতেই জড়বিজ্ঞানের উৎপত্তি, বিজ্ঞান-সহায়ে প্রথমে তা বুঝিয়ে পরে প্রাণায়াম বস্তুটা কি, বোঝাতে লাগলেন। এর আগে আমরা কয়জনেই তাঁর ‘রাজযোগ’ পুস্তকখানি ভালো করে পড়েছিলুম। কিন্তু আজ তাঁর কাছে প্রাণায়াম সম্বন্ধে যে-সকল কথা শুনলুম, তাতে মনে হল যে তাঁর ভেতরে যা আছে, তার অতি অল্পমাত্রই সেই পুস্তকে লিপিবদ্ধ হয়েছে।

সেদিন আমরা স্বামীজীর কাছে সাড়ে তিনটার সময় উপস্থিত হই। তাঁর প্রাণায়াম-বিষয়ক কথা সাড়ে সাতটা পর্যন্ত চলেছিল। বাইরে এসে সঙ্গিদ্বয় আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁদের প্রাণের ভেতরের প্রশ্ন স্বামীজী কেমন করে জানতে পারলেন? আমি কি পূর্বেই তাঁকে এ প্রশ্নগুলি জানিয়েছিলুম?

ঐ ঘটনার কিছুদিন পরে একদিন বাগবাজারে প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের বাটীতে গিরিশবাবু, অতুলবাবু, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী যোগানন্দ এবং আরও দু-একটি বন্ধুর সম্মুখে স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করলুম, ‘স্বামীজী, সেদিন আমার সঙ্গে যে দু-জন লোক তোমায় দেখতে গিয়েছিল, তুমি এ-দেশে আসবার আগেই তারা তোমার ‘রাজযোগ’ পড়েছিল আর বলে রেখেছিল যে, যদি তোমার সঙ্গে কখনও দেখা হয় তো তোমাকে প্রাণায়াম-বিষয়ে কতকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবে। কিন্তু সেদিন তারা কোন কথা জিজ্ঞাসা করতে না করতেই তুমি তাদের ভেতরের সন্দেহগুলি আপনি তুলে ঐরূপে মীমাংসা করায় তারা আমায় জিজ্ঞাসা করেছিল, আমি তোমাকে তাদের প্রশ্নগুলি আগে জানিয়েছিলুম কি-না।’

স্বামীজী বললেন: ওদেশেও অনেক সময়ে ঐরূপ ঘটনায় ঘটায় অনেকে আমায় জিজ্ঞাসা করত, ‘আপনি আমার অন্তরের প্রশ্ন কেমন করে জানতে পারলেন?’ ওটা আমার তত হয়না; ঠাকুরের অহরহ হত।

এই প্রসঙ্গে অতুলবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, ‘তুমি রাজযোগে বলেছ যে, পূর্ব-জন্মের কথা সমস্ত জানতে পারা যায়। তুমি নিজে জানতে পারো?’

স্বামীজী -- হাঁ, পারি।

অতুলবাবু -- কি জানতে পারো, বলবার বাধা আছে?

স্বামীজী -- জানতে পারি -- জানি-ও, কিন্তু details (খুঁটিনাটি) বলব না।